তাবেদারদের এত গত্রদাহ ও অস্হিরতা কেন?(দ্বিতীয় খন্ড)

চীনের সাথে বাংলাদেশের জোট বন্ধনের এখনই উপযুক্ত সময়

আওয়ামীলিগের প্রোপাগান্ডা বর্তমানে তুঙ্গে। তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার কে সর্বদা অস্হির ও অশান্তি তে রাখতে সচেষ্ট। ২০০১ এ নির্বাচনী ফল কে অস্বীকৃতি, শপথ না নেওয়া ও সংসদে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রমাণ করে যে তারা মোটেই গণতান্ত্রিক নয় এবং নয় তারা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পক্ষান্তরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার নামক উদ্ভট দাবী তুলে দেশের স্হিতিশীলতা ব্যাহত করতে চাইছে। যে তার বলছে সাবেক প্রধান বিচারপতির বদলে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন ব্যাক্তি। কিন্তু বিচারপতিরা সাংবিধানিক ভাবে নিরপেক্ষ যাতে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান না হলেও বর্তমান প্রধান বিচারপতি বা অ্যাপিলেট ডিভিশনের কেউ, এভাবে মোট ছয়টি নিয়ম রাখা আছে। সে কারণে সংবিধানে এই ছয় অপশনের বাইরে আওয়ামিলীগ তাদের পছন্দ মতন ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করলে কি বিএনপি, জমাত মেনে নিবে? আর ঠিক একই ভাবে বিএনপি ও জমাতের পছন্দের লোক আ লীগ মেনে নিবে? এখানে আ লীগের দ্বাবী যে যদি সবকিছু ঠিক থাকে তো সংবিধান মোতাবেক যিনি পরবর্তী প্রধান উপদেষ্টা হবেন তিনি হচেছন আসলে বিএনপির লোক যাকে বিএনপি আগে ভাগেই ঠিক করে রেখেছে। তো যদি আ লীগ দুজন কে ডিঙিয়ে বিচারপতি লতিফ কে প্রদান উপদেষ্টার জন্য সেট করে, এম. এ. সাঈদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হন এবং সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জনাব হারুন কে ৮ জন কে ডিঙিয়ে চীফ করেন তো বিএনপি করলে কেন এত্ত হিংসা? আবার উদ্ভট দ্বাবী যে বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়াার সাথে বর্তমান রাষ্ট্রপতিকেও পদত্যাগ করতে হবে। অথচ ১৯৯৬ সালে বিএনপির আব্দুর রহমান বিশ্বাসের অধীনেই তারা ১২ই জুন নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। কিন্তু জনগণ ২০০১ সালে আওয়ামিলীগ কে প্রত্যাখান করায় তারা সবদোষ তাদেরই নিযুক্ত করা রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সেনা প্রধান কে দ্বায়ী করে আসছে। এটা একধরণের ইবলিশী মনোভাব। কারণ জিতলে সবভাল কিন্তু হারলে তারা বলে তারা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার। যদি আওয়ামিলীগার-বাকশালীদের দ্বাবী অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ১২ ই জুনের নির্বাচনের ফলাফল সঠিক থাকে তো তাদের প্রাপ্ত ভোট ৩৮% ও বিএনপির ৩৬% এবং জাপা, জমাতের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণও নিশ্চয় সঠিক। সেক্ষেত্রে ছাল নাই কুত্তার বাঘা নামধারী কমুউনিষ্টদের প্রাপ্তভোট ০.৫% ও নয়(৩০০ আসনে কেবল আসম আব্দুর রব ছাড়া সকল কমুউনিষ্টদের জামানত বাজায়াপ্ত) যা গণার বাইরে তখন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি মূল্যবোধের দলগুলোর প্রাপ্ত ভোট নিশ্চয়ই ৬২%। কিন্তু ২০০০ সালে ভোটার তালিকা হওয়ার পর দেখা যায় যতজন ভোটার সে তুলনায় ২০০১ সালের আদমশুমারির হিসেবে প্রাপ্ত বয়স্কর সংখ্যা অনেক কম। ফলে তখন সেই সাবেক আওয়ামিলীগার আমলা ম. খা. আলমগীর তড়িঘরি করে আদমশুমারির রিপোর্ট ধামাচাপা দিয়ে ভোটার লিষ্টের সাথে সামনজস্য তথা গোজামিল দিতে বলেন। আওয়ামিলীগের ষড়যন্ত্র মূলক ক্ষেত রক্ষার প্রোগ্রাম বা তাদের সাজানো বাগান সত্ত্বেও ২০০১ সালের নির্বাচনে জোট ভোটের কাছে পরাজিত হয়। এ অঞ্চলের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত হওয়া তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাদের ইবলিশী মনোভাবের কারণে তারা এটা মানতে নারাজ যে দুচারটি দল মিলে জোট করে তাদের প্রত্যেকের দলীয় সমর্থকদের ভোট এক জায়গায় আনতে পারে। সে জন্যেই তারা অর্থাৎ আওয়ামিলীগার-বাকশালীরা জমাতের উপর প্রচন্ড গোস্বা। ১৯৯০-৯১(১৯৯১ তে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জনাব বদরুল হায়দার চৌধূরী কে সমর্থন দানের জন্য তাকে গোলাম আযমের বাসায় প্রেরণ ও একসাথে মাগরিবের নামায আদায়) ও ১৯৯৬ সালে রাজনৈতি দহরম মহরম বা রাজনৈকিত মধুচন্দ্রিমা ঠিকই জায়েয কিন্তু বিএনপি কে সমর্থন বা সরকারে যাওয় মানে বাংলাদেশ পুনরায় পরাধীন বা পাকিস্তান হয়ে যায় তখন তারা প্রতিহিংসায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে এবং জমাতের বিরুদ্ধে পুরোদমে ঝাপিয়ে পড়ে। আজকে যদি জমাত আ লীগ কে

সরকার গঠনে সমর্থন করত বা তাদের সাথে ক্ষমতার অংশীদার তো অনেক আগেই জমাত স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির সার্টিফিকেট পেয়ে যেত।

আমি এই লেখার সময় ২০০৫ এর চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে আ লীগের জনাব মহিউদ্দিন বিএনপির জনাব নাসির উদ্দিন কে প্রায় ৯১০০০ ভোটের ব্যাবধানে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতন মেয়র হলেন। তো তাদের উভয়েরই নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ধোপে টিকে না। জনাব নাসির উদ্দিনের উচিত গণতন্ত্রের রীতিনীতি স্বরূপ পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। কারণ ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন নির্বাচনে সরকারে যেতে না পারা কে যদি বিএনপি মেনে নিয়ে সুস্হ ও গণতান্ত্রিক মানসিকতার এবং দেশ প্রেমের পরিচয় দিতে পারে তবে তারও পারা উচিত এবং মনে রাখতে হবে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এই চারটির মেয়র কিন্তু বিএনপিরই। শহীদ জিয়াউর রহমানের কথা যে ব্যাক্তির চেয়ে দল বড় এবং দলের চেয়ে দেশ বড়। আমি মনে করি যে চট্টগ্রামের এই পরাজয় ব্যাক্তির পরাজয় কারণ স্মরণীয় যে ১৯৯৬ এর ১২ই জুন চট্টগ্রামই বিএনপিকে ১১ টি সিট উপহার দিয়েছিল(শহড় অঞ্চল সহ)। বর্তমান জোট সরকারের সময় রাসেল, মাহি বি চৌধূরী এম. পি এবং কামরান ও মহিউদ্দিন উনারা মেয়র হতে পেরেছেন। অথচ আওয়ামিলীগের উদ্ভটদাবী যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপক সংস্কার। যদি এই মেয়র নির্বাচন সুষ্ঠ হয় কোন দলীয় সরকারের অধীনে তো বর্তমান সংবিধানুয়ায়ী আগামী তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে কেন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ হবে না? কিন্তু আ লীগ ও আওয়ামিলীগারদের চিরাচরিত অভ্যাস যে জিতলে সব ঠিক কিন্তু হারলে সব ষড়যন্ত্র বলে চালিয়ে দেশের অবস্হা অস্হিতিশীল করা। এই চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচন কে বিএনপির শিক্ষা যে (১) জামাল উদ্দিনের অপহরণ ঘটনার কোন কিনারা না হওয়া, (২) জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধি, (৩) চার-চারজন মন্ত্রী(একজন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব আমীর খসরূ) তাদের কাজে দলীয় সমন্বয়ের অভাব, (৪) বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাদাবাজি-টেন্ডার বাজি, (৫) উন্নয়ন কাজ যথাযথ সময়ে শূরূ না হওয়া। কাজেই এখনই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, বিভিন্ন জমে থাকা উন্নয়ন মূলক কাজের প্রতি নজর দিতে হবে। নতুবা ভবিষ্যতে গোটা চট্টগ্রাম অঞ্চলেই ভরাডুবি হতে পারে জোট সরকারের জন্য। শুধূ তাই নয় সমগ্র বাংলাদেশে যেখানে জোট প্রার্থীগণ নির্বাচিত এমপি সেখানের উন্নয়ন পরিস্হিতি, তাদের জনসংযোগ এবং সেখানকার মানুষের সাথে খোলামনে আলোচনা করতে হবে। জোট সরকারের উচিত যেখানে তাদের আসন আছে এবং যে আসনগুলোতে আ লীগের সাথে ১০-১৫ হাজার ভোটের ব্যাবধানে পরাজিত হয়েছে সেগুলো কে এখন থেকেই গুরূত্ব দেওয়া হৌক। যেমন ২০০১ এ সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জনাব এইচ. কে. সাদেক মাত্র ৪০০(প্রায়) ভোটের ব্যাবধানে জোট প্রার্থীকে পরাজিত করে যশোর থেকে এমপি হন। অন্যদিকে গাজীপুরে একমাত্র জোটের এমপি তিনিও মাত্র ৪০০(প্রায়) ভোটের ব্যাবধানে পাশ করেছেন। তো এই গাজীপুর, ঢাকা-৮, ঢাকা-১০ আসনগুলির মত অন্যান্য যে সকল আসন হতে জোট সরকারের প্রার্থীগণ নির্বাচিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি আরো বেশী করে হোমওয়ার্ক করতে হবে। অবশ্যই যেখানে যেখানে কোন্দল তা মিটিয়ে ফেলতে হবে পরে এ নিয়ে পস্তালে ৫ বছর কোন লাভই হবে না। যেমন নিহত আহসানুল্লাহ্ মাষ্টারের ছেলে জাহিদ রাসেল তারা দুজনই ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৪ এ স্রেফ বিএনপির মধ্যকার উপদলীয় কোন্দলে পাশ করতে পেরেছেন। যাই হৌক ইতিমধ্যে অনেক তাবেদারজীবি, আওয়ামিলীগার ও তাদের অন্ধসমর্থকরা আবারো বলছে যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের আদলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তালার উপর বিশ্বাস, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও ইসলাম কে রাষ্ট্রীয় ধর্মের ঘোষণা বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র আমদানী করতে উপদেশ দিচেছন। বাংলাদেশের সংবিধান হতে পরম করূণাময় আল্লাহ্ তালা ও অন্যান্য ইসলামী মূল্যবোধের কথা তাদের প্রচন্ড গত্রদাহ এবং যেন তেন ভাবে তা মুছে ফেলার জন্য তার উদগ্রীব বা অস্হির। তারা যতই লম্ফযম্ফ করূক দেশের আপামর ৯০% লোকই সংবধািনে এ সকল ইসলামী মূল্যবোধের ধারা সমূহ সংবিধানে ধরে রাখতে বা অব্যাহত রাখতে চায়। বরং তারা তাদের কারণে যেখানে বাংলাদেশের ১০০% জনগণই ১৯৭০ এ বঙ্গবন্ধূর নেতৃত্বে আওয়ামিলীগের পতাকা তলে

এক হয়েছিল আজকে সেখানে বাংলাদেশের ৬০% লোকের নিকট হতে সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন। কবির চৌধূরী ও ওয়াহিদুল হক জাতীয় তাবেদারজীবিরা যতই উষ্মা করূক না কেন প্রকৃতপক্ষে ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন বাদে ১৯৯৬(১২ই জুন), ২০০১ এ আ লীগের পোষ্টার-ব্যানারে তথা তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, লা ইলাহা ইল্লাল লাহ্ নৌকার মালিক তুমি আল্লাহ্ এবং তাদের নৌকা নাকি হযরত নূহ (আঃ) নৌকা। এক দিকে তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মাধ্যমে উগ্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সাধারণ মানুষের ভোটের জন্য পুরা পাক্কা মুসলমান সাজার থেকে একটা সত্যই বেড়িয়ে আসে যে তারাতো আসলে মুনাফেক তো বটেই তাদের এলিট থিঙ্ক ট্যাংক গণবিচ্ছিন্ন যা কিনা শুধূ তাদের প্রভূ ভারতের কৃপা দৃষ্টির জন্য এবং সারাবিশ্বের কাছে তুলে ধরে যে আসলেই তারা তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ। আসলে এরা বাংলাদেশের জনগণ কে বিভক্ত করছে। দেশ কে কুটিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পিছিয়ে রাখছে। আজকে সারাদেশের মানুষের উপলদ্ধি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্হিতিশীলতা ও দূর্নীতির জন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন একেবারেই শ্লথ গতি সম্পন্ন। বস্তুত তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আড়ালে আওয়ামিলীগার-বাকশালী ও তাবেদারজীবিরা বাংলাদেশে কে একটি চিরস্হায়ী দূর্বল ও ভারতের গোলাম রাষ্ট্র বানিয়ে রাখতে চায়।

১৯৯৬ সালে যখন বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ব্যাবস্হা চালূ করে পদত্যাগ করে তখন বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২০৮ কোটি মার্কিন ডলার। আর টাকারও অবমূল্যায়নও ২/৩ বারের বেশী হয় নি(১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত দখলের কারণে ডলারের মূল্য ৩৫/৩৬ টাকা থেকে ৪০ টাকা এবং ১৯৯৬ জুন পর্যন্ত তা বেড়ে দাড়ায় ৪২.৫০ টাকা)। আর শেখ হাসিনার সরকারের সময় শুরূ থেকেই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতাসংস্হা সমূহ থেকে হাসিনার সরকারের সাহায্য বা ঋণ পেতে এতটুকু সমস্যা বা কঠিন শর্তের বেড়াজালে আটকে পরার মতও কোন শর্ত দেয় নাই। তবুও ব্যাংকিং সেক্টরে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিভিন্ন ব্যাংক হতে ঋণের পর ঋণ নিয়ে ব্যাংকের তারল্য সংকট বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়। হাসিনার সরকারের সময় টাকার ১৫-১৬ বার অবমূল্যায়ন হয়ে ১৯৯৬ সালে যেখানে ডলারের মূল্য ৪২-৪৩ টাকা ছিল সেখানে ২০০১ জুনের আগেই ডলারের মূল্য দাড়ায় ৫৯-৬০ টাকা এবং জুন ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাড়ায় মাত্র ১০২ কোটি ডলার। বিভিন্ন রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও জনসেবা মূলক কার্যক্রমে ব্যাপক দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। হাসিনার সরকার আসার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার মোট ১২ গ্যাস টি ফিল্ড পেট্রবাংলা সহ বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানী(হ্যালিবার্টন, শেল, অক্সিডেন্টাল, শেভরন ইত্যাদি)। কিন্তু শেখ হাসিনার সময় কোন বাছ বিচার না করে এবং পেট্রবাংলাকে কোন সুযোগ না দিয়ে ঢালাও ভাবে উল্লেখিত কোম্পানী সহ ইউনিকেল কে মোট ১১ টি গ্যাস ফিল্ড লিজদেয়। বাংলাদেশের একমাত্র গ্যাস উত্তোলন সংস্হা পেট্রবাংলাকে আ লীগ সরকার কোন বিবেচনায় আনে নি। সমূদ্র ও ২/১ টি বিশেষ গ্যাস ফিল্ড ছাড়া পেট্রবাংলার পক্ষে বাকিসবগুলো ফিল্ড হতে গ্যাস উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। অথচ বিদেশী কোম্নানীগুলো হতে একঘন ফুট গ্যাস কিনতে রাষ্ট্রকে ১.৫ মার্কিন ডলার ব্যায় নির্বাহ করতে হচেছ। মুখে তারা যাই বলুক যে তারা ৫০ বছরের গ্যাস মজুদ রেখে গ্যাস রপ্তানি করবে বললেও বিদেশী কোম্পানী সমূহের সাথে চুক্তি পত্রে তা মোটেও উল্লেখ ছিল না। শুধু তাই নয় চুক্তি সমূহের অনেক ধারাই ছিল বাংলাদেশের স্বার্থ পরিপন্হী। যেমন সিলেটের মাগুড়ছড়া গ্যাসফিল্ডে ভয়াবহ দূর্ঘটনা ঘটলেও অক্সিডেন্টাল কোম্পানীর থেকে আ লীগের কয়েকজন মন্ত্রী ঘুষ গ্রহণ করে রাষ্ট্রের ন্যায্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ প্রায় ২০০ কোটি টাকা হতে রাষ্ট্র কে বঞ্চিত করে। তারা এমন ভাবে কিছু নামকাওয়াস্তে অক্সিডেন্টালের সাথে সমঝোতা করে যে তাদের হতে তখন এবং বর্তমানে অক্সির দায়িত্ব বুঝে নেওয়া ইউনিকেল কতটাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে তা আর জানা যায় নি। ঐ সময়ে যখন বিদেশী কোম্পানীগুলিকে গ্যাস ফিল্ড লিজ দেওয়া হয় তখন আ লীগ সরকার দেশবাসী কে তো বটেই এমনকি সংসদেও এ নিয়ে বিন্দুমাত্র আলোচনা করে নি। বিএনপি, জাপা,

জামাত হাজারও আলোচনার দাবী করলেও সাবেক স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশিদ তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নি। কারণ শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীদের তরফ থেকে তো আর কোন গ্রীণ সিগনাল ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই জাম্বুরা মাথাওয়ালা(ডঃ কামাল হোসেন) হাইকোর্টে গ্যাস ফিল্ড লিজ সংক্রান্ত চুক্তির স্বচছতার চ্যালেনজ্ করে রীট করে। ফলশ্রূতিতে হাইকোর্ট সরকার কে রূলিং দেয় যে সরকার যেন বিদেশী কোম্পনীগুলোকে গ্যাস ফিল্ড লিজ দেওয়ার জন্য যে চুক্তি সমূহ করে তার সম্পূর্ণটাই যেন সংসদে আলোচনা করে তথা দেশবাসীর কাছে চুক্তির ধারা সমূহ পূর্ণ উল্লেখ করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বচছতা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যেই লাউ সেই কদুই রয়ে যায়। ঐ রিটের রূলিং এর পরও হাসিনার সরকার আরও কয়েকটি গ্যাস ফিল্ড বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানী কে লিজ দেয় এবং ডঃ কামালও কোন উচচ বাচ্য করেন নি। কারণ রূলিং এর কয়েকদিনের মধ্যে এই জাম্বুরা মাথাওয়ালা কে গ্যাস উত্তোলনকারী সংশ্লিষ্ট বিদেশী কোম্পানীগুলো বিপুল অংকের ঘুষ(১০-২০ কোটি) টাকা দিয়ে হাত করে ফেলেছিল। কিন্তু বিএনপি, জাপা, জামাত তারা যথারীতি স্পীকারের নিকট জোড় দ্বাবী জানিয়ে যায়। বিএনপির আমলে(১৯৯১-৯৬) সাপ্টা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও যে সকল ক্যাটাগরি তে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় পণ্য সুবিধা পাচিছল শেখ হাসিনার সরকার তা আরও অনেক ভারতীয় পণ্য কে উক্ত সুবিধা দেয়। কারণ ভারতও বিশেষ করে দেব গৌড়র সরকার শেখ হাসিনা কে মৌখিক আশ্বাস দেয় ঠিক যেমন টি নরসীমার সরকার খালেদা জিয়া কে আশ্বাস দিয়েছিল যে নিকট ভবিষ্যতে ভারতও বাংলাদেশী কিছু ক্যাটাগড়ির পণ্য কে ছাড় দিবে। কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। পরবর্তীতে দেব গৌড়া সরকার থেকে বাজপেয়ী সরকার পর্যন্ত শেখ হাসিনা হাজার চেষ্টা করেও বিভিন্ন ক্যাটাগড়ির ১২৫ টি পণ্যের ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করার বিশেষ সুবিধা আদায়ে সম্পূর্ণ ব্যার্থ হন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন ডকে পুরানো জাহাজগুলির ভাঙার মাধ্যমে যে সকল স্ক্রাপ সহ বিভিন্ন লৌহ ও ধাতবজাত উপাদান দেশীয় বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত হতো তাতে যে পুরোনো জাহাজ কেনার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়া শেখ হাসিনার সরকারের উদাসীনতার কারণে বাংলাদেশ পুরানো জাহাজ কেনার বা সংগ্রহ ব্যাবস্হা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ফলশ্রূতিতে এর উপর নির্ভরশীল দেশীয় শিল্পের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। শূধুই তাই নয় বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাটের অবস্হাও হয় অসহায়। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার আগে বার বার বলতেন যে তার দল ক্ষমতায় গেলে পাট চাষীদের থেকে সরকারী ভাবে ৫০০ টাকা মণ দরে পাট কিনবে। কিন্তু ১৯৯৬-২০০১ সাল দেখা যায় কোনমতে যদি মণপ্রতি ১৫০ টাকা মিলে তো তাতেই কৃষকরা আল্লাহ্ তালার কাছে শুকুর গুজার করত। বস্তুত হাসিনার সরকারের ব্যার্থতার জন্যই বাংলাদেশ পাটের আন্তর্জাতিক বাজার হারিয়ে ফেলে। আর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও হাসিনার সরকার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য রূশ নির্মিত ৮ টি মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান কিনে যার প্রতিটির দাম পড়েছিল বাংলাদেশী টাকায় ৭৭ কোটি। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগণ মনে করে যে এই জঙ্গী বিমান গুলো আমাদের জন্য এত বিপুল ব্যায়ে কেনা স্রেফ অর্থহীন তাও আবার রূশ বিমান বাহিনীর ব্যাবহৃত সেকেন্ডে হ্যান্ড মডেল। আর একই সেকেন্ড হ্যান্ড জঙ্গী বিমান মায়ানমার(বার্মিজ) বিমান বাহিনী প্রতিটি ২৫ কোটি টাকা মূল্যে বেশ কয়েক টি সংগ্রহ করেছে। ইতিমধ্যে তিন টি বিমান অকেজো হয়ে পড়েছে। এই মিগ বিমান কেনার ব্যাপারেও সরকার কোন চুক্তিপত্র সংসদ বা জাতি কে অবহিত করেনি। দক্ষিণ কোরিয়ার ডেইউ কোম্পানী হতে নৌবাহিনীর জন্য কেনা ফ্রিগেট নিয়েও হাসিনার সরকার স্ক্যান্ডালের জন্ম দেয়। দেশে বিভিন্ন বিদেশী বিনোয়েগের জন্য বেশ কয়েক টি আগ্রহী বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী কে আওয়ামিলীগার মন্ত্রীরা উৎকোচ ও বিভিন্ন সুবধিা দ্বাবী এবং অতি উৎসাহী সরকারী আমলারা যারা আ লীগ সরকারের চাটুকার তারাও ব্যাপক দূর্নীতির চেষ্টা করলে বেশীর ভাগ বিদেশী বিনোয়গ পিছুটান দেয়। ১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজারে আ লীগ সমর্থক কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যাক্তি ও কয়েকজন মন্ত্রী এবং কিছু মাড়োয়ারী ব্যাবসায়ী যেমন হর্ষদ মেহ্তা কারসাজি ও ষড়যন্ত্র করে কৃত্রিম ভাবে শেয়ারের দাম ৫-৬ গুন বাড়িয়ে দিয়ে তা সাধারণ ও নিরীহ শেয়ার ব্যাবসায়ী-ব্রোকার-ক্রেতার হাতে গছিয়ে দিয়ে বিপুল পরিশাণ টাকা প্রায় ৪০-৬০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে সটকে পড়ে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। যেখানে ১২ জুন ১৯৯৬ সালে যে শেয়ার

টির দাম ছিল ২০০-২৫০ টাকা তা সর্বোচচ ৯৫০-১০৫০ টাকা দাম উঠে হঠাৎ পতন ঘটে তার দাম দাড়ায় ১০০-১৫০ টাকা। পরিণামে ৩-৪ লক্ষ নিরীহ সাধারণ শেয়ার লেনদেনকারী চরম শোচনীয় ও ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়। কেউ জায়গা জমি বিক্রি-বন্ধক, কেউ চাকুরী জীবি দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত অর্থ, ছোট-মাঝারি ব্যাবসায়ী তারা তাদের কষ্টার্জিত টাকা বিনিয়োগ করে লাভের আশা করেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম কে জানে যারা ১৯৭৪ সালে ব্যাপক ফলন হওয়া সত্ত্বেও স্রেফ বন্যার ও আমেরিকার সাহায্য না করার অজুহাতে দেশকে দূর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে লক্ষ লোক কে অনাহারে রেখে মৃত্যুমুখে ফেলে দেয় তারা কি আর শেয়ার ব্যাবসায়ীদের সাথে ফেরেশতার মত আচরণ করবে। ঐ শেয়ার বিপর্যয়ে বহু মানুষ পথে বসে ও সর্বসান্ত হয় এমন কি অনেক লোক কেউ বা মধ্যপ্রাচ্য, মালয়শিয়া যাওয়ার বদলে এই শেয়ার বেচা কেনায় জড়িয়ে পড়ে তারাও নিদারূণ দুঃখ কষ্ট ও তাদের আত্নীয়-স্বজনদের করুনার পাত্র হয়। আত্নীয়তা তো বটেই অনেকের সংসার পর্যন্ত ভেঙ্গে যায় এবং কারো কারো ছেলে-মেয়ের শিক্ষা অর্থের অভাবে বন্ধ হয় এবং পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন রোগ অসুখের চিকিৎসা না করতে পারা সহ বহু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের অবর্ণনীয় দূর্ভোগের শিকার হতে হয়। তাও নামকা ওয়াস্তে হাসিনার সরকার শেয়ার জালিয়াতির মূল হোতাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দূর্বল ভিত্তির উপরে এমনভাবে কয়েকটি মামলা দ্বায়ের করা হয় যে না পাড়ছে তা প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দিতে না এখন সম্ভব হচেছ দোষীদের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দিতে। ঐ শেখ হাসিনার সরকারের সময় ১৯৯৮-৯৯ সালেই তৎকালীন সিকিউরিটি এক্সচেনজ্ কমিশনের চেয়্যারম্যান নিজেই স্বীকার করেন, যে সমস্ত জোড়াল ভিত্তি ও যেভাবে মামলা রূজু করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। কি এমন রহস্য যে শক্ত ও জোড়াল ভাবে মামলাগুলো দাড় করানো হয়নি? এর থেকে একটাই সত্য বেড়িয়ে আসে যে শেখ হাসিনার সরকারের হাইকমান্ডের নির্দেশেই এমন টি হয়েছিল। কারণ সিকিউরিটি এক্সচেনজ্ কমিশন কে ঠুটো জগন্নাথ বানাতে শেখ হাসিনার সরকারের বেশী নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয় নি। বর্তমানে সিকিউরিট এক্সচেনজ্ কমিশন ও জোট সরকারের কঠোর মনিটরিং এর ফলে শেয়ার বাজারে বড় ধরণের বিপর্যয় ঘটে নি। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও কয়েক টি বেসরকারী ব্যাংক হতে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে তাদের অবস্হাকে টালমাটাল করে দিয়েছিল এবং দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও তারল্য সংকট দেখা দেয়। মোদ্য কথা শেখ হাসিনার সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যাবস্হাপনার জন্য অশনি সংকেত বাজতে শুরূ করেছিল। তারপর যেখানে ১৯৯৫ সালে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে দূর্নীতিগ্রস্হ দেশ হিসেবে যেখানে নাইজেরিয়া এক নম্বরে, পাকিস্তান পাঁচ নম্বরে ও ভারত নয় নম্বরে ছিল সেখানে বাংলাদেশ ১১-১৫ তেও ছিল না। কিন্তু মোটামুটি সবাই কে তাক লাগিয়ে ২০০১ সালে ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর দূর্নীতিগ্রস্হ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। হবেই না কেন ২১ বছররের ভুখ আওয়ামি-বাকশালীরা চার বছরে মিটিয়েছে। অতীতে দূর্নীতি ছিল এমন ক্ষেত্রের দূর্নীতির বহুগুণ বৃদ্ধি তো বটেই বরং আরো নতুন নতুন অনেক ক্ষেত্রে তারা দূর্নীতি ঢুকিয়ে গেছে। যে দেশ বিগত ২১ বছরে তলা বিহীন ঝুড়ির অপবাদ ঘুচিয়ে ইমার্জিন টাইগার হয়, শীর্ষ দূর্নীতিগ্রস্হ ১-১৫ এর মধ্যে ছিলনা সে জন্যেই শেখ হাসিনার সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রারম্ভে বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, ইউ ও অন্যান্য দাতা সংস্হা হতে সাহায্য, ঋণ ও বিভিন্ন সহায়তা পেতে তেমন কোন বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু বর্তমান জোট সরকার আসার পর উল্লেখিত সংস্হা সমূহ বাংলাদেশ কে কঠিন থেকে কঠিন তর শর্ত সমূহ আরোপ করে ফলে ২০০২-০৪ অবধি জোট সরকার নামকাওয়াস্তে কিছু সাহায্য বা লোন পায় যা শেখ হাসিনার সরকারের ক্ষমতায় গ্রহণের সময় প্রচুর পরিমাণে বা যথেষ্ঠ পেয়েছিল। বিগত ২১ বছর(১৯৭৫-৯৬) হাসিনা কতৃক কটাক্ষিত সময় যদি এতই খারাপ হত তো এত্ত লোন ও সাহায্য কেমনে জুটল? তবুও তার মুখ কখনই থামে না বরং বার বার বলেন যে আ লীগ-বাকশাল-আ লীগ সরকারী আমল ছাড়া দেশে নাকি কোন উন্নতিই হয় নি, যদিও আওয়ামিলীগার-বাকশালীদের আমলেই বাংলাদেশ সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী কলংকিত হয়। ২০০১ সালে অবস্হা এমন দাড়ায় যে জোট সরকার একে তো দাতা সংস্হা বিমূখ তার উপর ৯/১১ ও আফগান যুদ্ধের কুপ্রভাব হাসিনার সরকারের দূর্নীতিগ্রস্হ-বিশৃঙ্খল-ভঙ্গুর অর্থনীতি ও লো রিজার্ভের ফরেন

কারেন্সির মোকাবেলার এক কঠিন পরিস্হিতি মোকাবেলা করতে হয়। দেশে উক্ত কারণে সাধারণ মানুষ কে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গড়পড়তায় উচচ মূল্যে কিনতে হলেও জোট সরকারের দেশ প্রেমিক কর্মকান্ডে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এখন বর্তমানে প্রায় বহুলাংশে আশংকা মুক্ত। শূধূ তাই নয় সরকারের দেশে আইনের শাসন রক্ষায় কঠোর অবস্হান গ্রহণে দেশের অর্থনীতিতে দারূণ সুবাতাস বইছে এবং দেশের ভবিষ্যত সমৃদ্ধ অর্থনীতির সূর্য উজ্জল আভা বিলাচেছ। সকল প্রশংসা ঐ পরম করূণাময় আল্লাহ্তালার। আজকে ভারতের টাটা গ্রূপ, আমিরাতের ধাবী গ্রূপ, মধ্যপ্রাচ্যর আরও কয়েক টি দেশ বাহারাইন, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব সরকারী বেসরকারী ভাবে, এই দিকে থাইল্যান্ড-চীন-মালয়শিয়া-সিঙ্গাপুর, ইউরোপের ইটালী-ফ্রান্স-বৃটেন, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার বিভিন্ন বেসরকারী কোম্পানী গার্মেন্টস, ঔষধ-রসায়ন, গ্যাস-বিদ্যূৎ, তেল শোধনাগার, খনিজ দ্রব্য(কয়লা-কঠিন শিলা), ইস্পাত, হাল্কা-ভারী মেশিনারী টুলস্, আইসিটি-টেলিযোগাযোগ, পর্যটন সহ আরো অনেক ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশী সরাসরি বিনিয়োগ(FDI) প্রস্তাব আছে যেখানে আ লীগ আমলে মাত্র ০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয় যার ০.৬ বা ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারই বিনিয়োগ হয় শূধূ গ্যাস সেক্টরে। আবারো বলি আল্লাহ্তালার অপার রহমতে এবং জোট সরকারের দেশপ্রেমিক ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজকে বাংলাদেশ একটি প্রচন্ড অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় দেশ। নিশ্চয়ই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কে পাগলা কুত্তা কামড় দেয় নি যে তারা আওয়ামিলীগার-বাকশালী-ভারতীয় ব্রাম্মণবাদী ও তাদের প্রভাবধীন টাইমস্ এর মতন পত্রিকাওয়ালাদের মতে একটি ব্যার্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে অতগুলো টাকা বিনিয়োগ করবে? কিন্তু আওয়ামিলীগার-বাকশালী-তাবেদারজীবিরা নিশ্চিতভাবে পাগলা কুত্তা হয়ে গেছে এবং তাদের ঘূমও হারাম হয়ে গেছে। কারণ জোট সরকারের এ ধরণের দারূণ সাফল্যে তাদের প্রচন্ড হিংসা ও গত্রদাহ এবং অস্হিরতা শূরূ হয়েছে। কারণ এগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রচন্ড গতি অর্জন করবে এবং দেশের দারিদ্র ঘুচবে এবং একে ও তার জনগণ কে আর ভারতের তাবেদারী করানোর সুজোগ থাকবে না। সে জন্যেই বিএনপির লোক কাইয়ুম কে দিয়েই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্হা RAW জনাব কিবরিয়ার হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। মনে রাখতে হবে জেনারেল মনজুও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অত্যন্ত আস্হাভাজন ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় "র" অত্যন্ত সুকৌশলে স্রেফ সেনাবাহিনী প্রধানের পদ না দেওয়ায় তাকে জিয়াউর রহমানের বিরূদ্ধে লেলিয়ে দেয়। কারণ ৩০শে মে ১৯৮১ সালের জিয়া হত্যাকান্ডের পর যখন কুমিল্লা সেনানিবাস তার(জে মনজুর) সহযোগিতার অনুরোধ প্রত্যাখান করে তখন সে চোখে অন্ধকার দেখে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয়ের জন্য পালানোর চেষ্টা করে। বস্তুত ভারত সরকার ও "র" তাকে নিরাপদে ভারতে ত্রিপুরা দিয়ে ঢুকতে দেওয়া এবং আশ্রয়ের জন্য সকল ব্যাবস্হা পাকা করে রেখেছিল। কিন্তু বিধিবাম তাকে শেষমেষ কুদ্দুস দারোগার হাতে ধরাপড়তে হয় ও নির্মম ভাবে নিহত হতে হয়। ঠিক তেমনি ভাবে কিবরিয়া সাহেবের ঘাতক যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল সে কিন্তু চুনারঘাট সীমান্ত মোটর সাইকেলে করে অবৈধ ভাবে পার হয়ে সপ্তাহ খানেকের উপর ভারতে অবস্হান করে পুনরায় দেশে ফিরে। ভারতীয় বিএসএফ এবং তার দেশের অভ্যন্তরে পুলিশের সহায়তা ছাড়া কারো পক্ষে অবৈধভাবে মোটর সাইকেলে করে এ ভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে ২০০৪ সালের বন্যার মধ্যেই শেখ হাসিনা ভারতে যান সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত সফরে যাতে ভারত সরকারের কোন আমন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু এই সফরে তিনি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্হাসমূহ তো বটেই এমনকি অনানুষ্ঠানিকভাবে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একঘন্টা ব্যাপী বৈঠক করেন। ঠিক জুলাই মাসে তার ভারত সফর এবং আগষ্টের ২১ তারিখে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা অবশ্যই কাকতলীয় নয়। ঠিক তেমনি ভাবে জলিল ও ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব শরজিৎ চ্যাটার্জীর ডিসেম্বর'০৪ এর সেমিনারে বক্তব্য যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষার্থে ভারত কে এগিয়ে আসার আহবান এবং ভারত আর বেশীদিন ট্রানজিটের জন্য অপেক্ষা করতে পারবে না এবং এ বছরের জানুয়ারীতে জলিলের ভারতীয় "র" প্রধানের সাথে গোপন বৈঠকের মাসেই জনাব কিবরিয়ার হত্যাকান্ড একই সুতায় গাঁথা। কারণ জনাব কিবরিয়া নাকি বৈদ্যর বাজার সভায় যেতে ইচছুক

ছিলেন না। স্বয়ং শেখ হাসিনার নির্দেশে বাধ্য হয়েই তিনি এ সমাবেশে আসেন। অবশ্যই বিএনপির কাইয়ুম বা স্হানীয় আ লীগের পক্ষে তাকে অসময়ে(কোরবানী ঈদ উত্তর) বৈদ্যর বাজারে নিয়ে আসা কোনমতেই সম্ভব নয় যা শেখ হাসিনার বা আ লীগের হাইকমান্ডের নির্দেশে সম্ভব। আর হঠাৎ কাইয়ুমের পক্ষেও ২/১ দিনের ব্যাবধানে এ ধরণের নারকীয় ঘটনা ঘটানোর প্রস্তুতি সম্ভব নয়। এটা অবশ্যই ভারতীয় "র" এর ভয়ঙ্কর ব্লুপ্রিন্ট যার মাধ্যমে তারা কাইয়ুম ও তার সহযোগীদের কে দিয়ে প্রস্তুত রেখেছিল এবং শেখ হাসিনাকেও বলাছিল জনাব কিবরিয়া কে নির্দেশ দেওয়ার। ১৯৮১ সালের ৩১ শে মে শেখ হাসিনা ব্রাম্মণবাড়িয়ার কসবা থানায় আটক হয়েছিল সন্দেহজনক অবস্হানের কারণে পরে আত্নীয়র বিয়ের অনুষ্ঠানের অজুহাতে সে যাত্রা পার পায়। কারণ এটা মোটেও কাকতলীয় নয় যে ১৯৮১ এর ১৮ই মে দেশে প্রর্ত্যাবর্তন ও তার ঠিক ১২ দিন পর জিয়ার হত্যাকান্ড। কারণ এগুলোর কলকাঠি ভারত নাড়ে। অথচ বাংলাদেশের স্বার্থে জনাব তারেক রহমান আমেরিকায় এলে কোন কোন আঁতেল কটাক্ষ করেন। যদি শেখ হাসিনা ব্যাক্তিগত সফরে স্বয়ং ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর দর্শন ও রাষ্ট্রীয় বিদেশী অতিথির মর্যাদা পান সেখানে বাংলাদেশের পণ্যের সবচেয়ে বড় আমদানী কারক দেশে, রাষ্ট্রীয় বা হৌক না সেটা দলীয় স্বার্থে যদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনাব বুশের সাথেও দেখা করে তো বাকশালী-তাবেদারজীবিদের এত্ত গত্রদাহ কেন? শেখ হাসিনা ভারত যান দেশের স্বার্থ বিকিয়ে বাংলাদেশে গন্ডগোল ও অশান্তি সৃষ্টি করতে। পক্ষান্তরে জনাব তাররক রহমান গেছেন বিনিয়োগ সহ বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ অবস্হা অব্যাহত রাখার তথা দেশীয় স্বার্থের অনূকুলে। আল্লাহ্‌র রহমতে যদি তারেক রহমান বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী হন তো তিনি হবেন স্বাধীন বাংলাদেশের সত্যিকারের প্রধানমন্ত্রী ঠিক যেমন তার মা প্রধানমন্ত্রী এবং কোনমতেই বাংলাদেশের মূখ্যমন্ত্রী নন।

১৯৯৬-২০০১ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ছিল সম্পূর্ণ ভারত নির্ভর। দুটি ঘটনা তার প্রমাণ (১) কসোভোয় বর্বর সার্বিয়ান বাহিনীর উপর ন্যাটো তথা মার্কিন সামরিক ব্যাবস্হা গ্রহণের বিরূদ্ধে ভারতীয় সুরে প্রতিবাদ জানানো এবং (২) নিরাপত্তা পরিষদে স্হায়ী সদস্য পদ লাভে জাপানের পরিবর্তে ভারত কে সমর্থন দান। এছাড়াও এশিয়ান হাইওয়ে যা ভারত থেকে বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ দিয়ে ঢুকে কুমিল্লা-ফেনী-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হয়ে সরাসরি মায়ামারে প্রবেশ করার কথা ছিল, সেটাকে ভারতীয় মনোভাবের কারণে তথা তার স্বার্থে আওয়ামিলীগার তথা শেখ হাসিনার সরকার কুমিল্লা দিয়ে সরাসরি ভারতের ত্রিপুরায় ঢুকার নতুন প্রস্তাব রাখে। যা প্রকারন্তরে ভারত কে ট্রানজিট দেওয়া। তখন দেশব্যাপী শেখ হাসিনার সরকারের এই তাবেদারী নীতির বিরূদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশ গর্জে উঠে। পরবর্তীতে মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া যৌথ বিবৃতিতে বলে যে তাদের প্রস্তাবিত পথেই এশিয়ান হাইওয়ে নির্মিত হবে ভারতের মতানুযায়ী নয় এবং এশিয়ান হাইওয়ে কারো ক্রীড়ানকের জন্যে নির্মিত হবে না। আবার ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটান কে নিয়ে বিতর্কিত উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনে ভারতীয় প্রস্তাবে শেখ হাসিনার সরকার আনন্দে মেতে উঠে। যাতে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টন, ট্রানজিট, পররাষ্ট্রনীতি, যৌথ সামরিক ব্যাবস্হা ইত্যাদি বাংলাদেশের স্বার্থ ও স্বার্বভৌমত্ব বিরোধী প্রস্তাব ছিল। কারণ একটা বিষয় পরিস্কার যে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান ছোট ও দূর্বল রাষ্ট্র এবং তাদের পক্ষে এ সকল ভারতীয় আবিস্কৃত রীতি নীতি অনুসরণ করলে নিজস্ব সরকারী ও প্রশাসনের সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ড সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় ইচছার উপর নির্ভর করবে। স্পষ্টতই এ ধরণের উপ-আঞ্চলিক জোট গঠিত হলে ভারতই একতরফা লাভবান হবে এবং বাকি তিন দেশের হাতে মূলা ধরিয়ে দেওয়া হবে। কারণ বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটানের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভারতের উপর নির্ভর করবে যা সহজেই অনুমেয় যে ভারত কেমন দয়াবান। ভারতীয়রা ঠিকই বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে আসাম-ত্রিপুরা যাবে ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যাবহার করবে কিন্তু বাংলাদেশ নেপাল ও ভূটানের জন্য ভারত ট্রানজিট দিবে কিনা সে বিষয়টি পরবর্তীতে অর্থাৎ ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঠিক যেমন বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার অভাবে ভারতীয়রা ৪৫ দিনের পরীক্ষার কথা বলে চিরস্হায়ী ভাবে বাংলাদেশ কে ন্যায্য পানির হিস্যা হতে বঞ্চিত করে ফারাক্কা বাঁধ চালু

করেছিল। ভারত টালবাহানায় কেমন ওস্তাদ তা উপমহাদেশের অন্যান্য দেশ ভালভাবেই জানে। আর ভারতের সেভেন সিষ্টার্সে স্বাধীনতা আন্দোলন ঠেকানোর নামে ভারত বাকি তিনটি দেশের সামরিক বাহিনীর প্রতিটির সাথে আলাদা আলাদা ভাবে যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহে প্রবেশ করে অভিযান চালাতে পারবে যা সে যখন চাইবে। ফলে এই তিনটি দেশ কার্যত ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হুকুমের আওতায় চলে যাবে। আর লক্ষ্যনীয় বিষয় হচেছ এই যে ভারতের প্রস্তাবিত উপ-আঞ্চলিক জোটের রূপরেখায় অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টনে বহুপক্ষ নয় ভারত শুধূ নিজেই আলাদা আলাদা ভাবে বাংলাদেশ ও নেপাল এবং ভুটানের সাথে চুক্তি করবে। অর্থাৎ ভারত ঠিকই নেপাল ও ভুটান হতে তার প্রাপ্যর চেয়ে বেশী পানি নিবে কিন্তু বাংলাদেশের সামনে মুলা ঝুলাবে এবং তাতেই আওয়ামিরীগার-বাকশালী-তাবেদারজীবিরা আনন্দ উল্লাস করে। ১৯৯৬-৯৭ সালে শেখ হাসিনার সাথে দেব গৌড়ার সাথে গঙ্গা চুক্তি কোন গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়াই সম্পাদিত হয়। ভারত বলে যে ৭০-৮০ হাজার কিউসেক পানি শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কা পয়েন্টে নিশ্চিত হলে তারা বাংলাদেশ কে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি দিবে। কিন্তু ঐ যে বলে গাঁধার সামনে মূলা ধরা কারণ গঙ্গার পানি ফারাক্কায় পৌছানোর আগেই ভারত অনেক দিন ধরে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সমুহের জন্য পাম্প দ্বারা বিপুল পরিমাণ পানি টেনে নেয় তো কিভাবে সেখানে(ফারাক্কা বাঁধ এলাকায়) ৭০-৮০ হাজার কিউসেক পানি জমবে? আর এ বিষয় টি আওয়ামিলীগার-বাকশালী-তাবেদারজীবি রা জেনেও না জানার ভান আরকি ভাজা মাছটা উল্টে খেতে না জানার ভান করে এবং কেবলই ভারত বন্দনা ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি দ্বাবী করে শিয়াল-কুকুরের মত শোরগোল তুলে। অথচ বর্ষা মৌসুমে সময় মত ফারাক্কার বেশী সংখ্যক গেট না খুলার কারণে বাংলাদেশ কে বানের পানিতে সয়লাব করে দেয়। সদ্যগত মে মাসে এক সেমিনারে ভারতীয় হাই কমিশনার মিজ বিনা সিক্রি দাবী করেন যে ভারত ঠিকই পানি দিচেছ কিন্তু বাংলাদেশের নাকি পানি ব্যাবস্হাপনা কার্যকরী নয় এবং বাংলাদেশ নাকি বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রাখতে পারে না। উনার কথায় আমার বলতে হচেছ এই যে বাংলাদেশ কি পারে বা পারে না কিন্তু বাংলাদেশ হচেছ আস্ত গাধা। কারণ আওয়ামিলীগাররা সারা দেশে ও বিশ্বে বগল দাবা ও গলাবাজি করে যে বিগত ২১ বছরে কোন সরকার এত্ত সফল পানি চুক্তি করতে পারে নি যে তারা নাকি শুক্ক মৌসুমের জন্য গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়াই ৩৫ হাজার কিউসেক পানি আনতে সমর্থ হয়েছে অথচ এখন ভারতীয়রা বলছে বর্ষা মৌসুমে পানি ধরে রাখার জন্য। যদি ভারতীয়দের মতে বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশ পানি ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করে তো শেখ হাসিনার পানি চুক্তি করে লাভ হলো টা কি? আসলে আওয়ামিলীগার-বাকশালী-তাবেদারজীবিরা বাংলাদেশ কে ভারতের নিকট গাধা বানিয়ে রেখেছে যে শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমের পানির পরিমাণের যোগফল করে বলে যে তারা(ভারতীয়রা) বাংলাদেশ কে প্রাপ্যর চেয়ে বেশী পানি দিচেছ অর্থাৎ গাধার সামনে চিরস্হায়ী ভাবে মূলা ঝুলিয়ে রাখছে। আর তাতেই কুলাঙ্গার রাম ছাগল ভারতীয় তাবেদার সাবেক(শেখ হাসিনার) পানি সম্পদমন্ত্রী রাজ্জাক ভারতের সাথে সম্পাদিত পানি চুক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পক্ষান্তরে বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাতিসংঘে ভারতে এ ধরণের প্রতারণা তুলে ধরলে তাবেদার রাজ্জাক তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। এই কুলাঙ্গার রামছাগল ভারতীয় তাবেদার কে দেশপ্রেমিক জনতার আদালতে বিচার করা উচিত। আজকে আন্তনদী সংযোগ ও টিপাইমুখী বাঁধ নির্মাণ সহ আরও ৫৩ টি অভিন্ন নদ-নদীর পানি ভারত কতৃক শুক্নো মৌসুমে এক তরফা প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশ কে আগাম বন্যার সতর্কতা না জানিয়ে সব বাঁধ খুলে দিয়ে বন্যার পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলে আওয়ামিলীগার-বাকশালীরা ও তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কোন শব্দ করে না। আর বিএসএফ বাংলাদেশে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করে এদেশের মানুষ-বিডিআর হত্যা-যখম, লুটপাট ও হুমকি-আতংক ছড়ায় তো তখন এই স্বাধীন চেতা জোট সরকার দেশের স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্ব রক্ষায় যখন পদক্ষেপ নেয় যা বিডিআর সম্পূর্ণ আত্নরক্ষার্থে গুলি চালালে তাতে যদি অসভ্য বর্বর ঘাতক(নিরীহ বাংলাদেশী ও বিডিআর হত্যাকারী) বিএসএফ নিহত হয় তাহলেই আওয়ামিলীগার-বাকশালীরা তারস্বরে জোট সরকারের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করে। এসব হল কুলাঙ্গার রামছাগল ও ভারতের পরম তাবেদার। এই বিএসএফ কেমন অসভ্য বর্বর তার প্রমাণ সদ্যগত মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বশির

হাট জেলার সীমান্ত এলাকায় এক ভারতীয় রমণী কে বাংলাদেশী অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মনে করে বিএসএফ তাকে ধর্ষণ করার খায়েশে তাকে ধাওয়া করে এবং শেষমেষ তাকে নাগালে পেতে ব্যার্থ হয়ে এমনকি তাদের ট্রাক দিয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টাও বিফল হয়, যদিও মহিলা আর পালানোর জন্য যথেষ্ট শ্বাস না থাকায় হাপিয়ে মাঠে পড়ে যায় বিএসএফ এর একজন যাওয়ান সেখানে দৌড়ে যেয়ে(ট্রাক সেই মাঠে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না) মহিলার পেটে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করলে ঘটনাস্হলেই সে নিহত হয়। তার স্বামী বশির হাট জেলার একজন ভ্যান চালক এবং এ ঘটনার জের ধরে বশির হাটের সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ বরাবর সীমান্ত অঞ্চলে সাধারণ ভারতীয়রা ক্ষোভে-ক্রোধে বিক্ষুদ্ধ-উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পরবর্তীতে বিএসএফ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন নাকে কানে ক্ষত দিয়ে এবং ঘাতক বিএসএফ যাওয়ানের ও তার সহযোগীদের বিচারের আশ্বাস দিলে পরিস্হিতি স্বাভাবিক হয়। আজকে যদি বিএসএফ এমন কান্ড কোন বাংলাদেশী রমণীর সাথে ঘটাতো তহালে কি তার বিচার হত? আজকে জমাতের কেন ভোট বৃদ্ধি পাবে না কারণ স্বাধীনতা অর্জনের পর হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্বের প্রতি আওয়ামিলীগার-বাকশালী-তাবেদারজীবিদের এ ধরণের ভারতীয় তাবেদারী তাদের(জামাত কতৃক) ১৯৭১ সালে ভারত ভীতি বিভিন্ন মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বস্তুত আওয়ামিলীগার-বাকশালীদের ভারতের প্রতি অন্ধ প্রেম ও তাবেদারী জামাত কে বাংলাদেশে রাজনীতি করার পথ সুগম করে দিয়েছে এবং এবং ভবিষ্যতে আরও তাদের কে শক্তশালী করে তুলবে। সেজন্যেই আওয়ামিলীগের সাধারণ সমর্থকদের উচিত তাদের নিজ দলের ধর্ম নিরপেক্ষতার নামধারী ইসলাম বিদ্বেষী ও ভারতীয় তাবেদার গ্রূপটিকে প্রতিহত করা। নতুবা পরবর্তীতে জামাত আরও বলীয়ান হলে তার বিরূদ্ধে লেখলে বা আন্দোলন করলে কোন লাভ হবে না বরং জামাতের কাছে মার খেতে হবে।

(আগামী খন্ডে সমাপ্ত)

মোঃ মোস্তফা কামাল,
ঢাকা, ২-৬-২০০৫ ইং।